বিক্ষোভে বিদ্রোহে প্রকাশ কর্মকার

দেবকুমার সোম এবার কলম ধরছেন শিল্পী প্রকাশ কর্মকারকে নিয়ে।

১৯৩৩-এ *উটপাখি* কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জানালেন ‘ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে? / মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।’ এই কবিতার শেষের দিকে সেই অমোঘ উক্তি ‘অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?’ সুধীন্দ্রনাথ মূলত দুঃখবাদী কবি। তাঁর কবিতায় ক্ষয়ের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ১৯৩০-এর দশকে। আর আশ্চর্যের এই, ১৯৩৪ সালে জন্ম চিত্রী প্রকাশ কর্মকারের। চিন্তায়-চেতনায় যিনি একজন ‘সংগ্রামী শিল্পী’। ফলে যার জন্ম ক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে, জাতিদাঙ্গা-দেশভাগে যার কেটেছে কৈশোর, সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সমূহ অধঃপতন যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন পাঁচ আর ছয়ের দশকে, তাঁর শিল্পের ভূমি জুড়ে যে বিক্ষোভ আর বিদ্রোহের চোরা স্রোত বইবে তা আশ্চর্যের নয়।

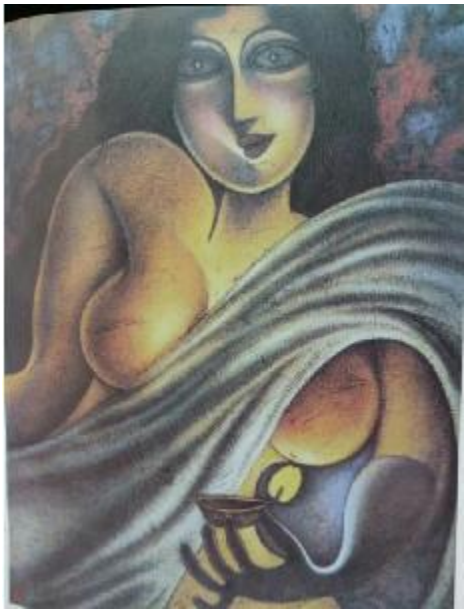

প্রকাশ কর্মকারের জন্ম কলকাতায়। ১৯৪৯ / ৫০-এ ছিলেন গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র। কিন্তু আর্থিক কারণে এক বছরের মধ্যেই প্রথাগত শিক্ষা শেষ। প্রকাশের পিতৃদেব ছিলেন সেকালের আন্তর্জাতিক খ্যাতিবান চিত্রী প্রহ্লাদচন্দ্র কর্মকার। প্রকাশের বারো বছর বয়সে বাবা মারা যান। তারপর ছেচল্লিশের জাতিদাঙ্গায় দুষ্কৃতিরা প্রহ্লাদচন্দ্রের স্টুডিও পুড়িয়ে দিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলোকে ধ্বংস করে। বারো বছরের প্রকাশও রেহাই পান না। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সে-এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়। দীর্ঘ চিকিৎসায় কোনরকমে বেঁচে উঠলেন বটে, তবে সেই চরম আর্থিক অবস্থায় বেঁচে থাকাটাই অলৌকিক। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরেই মা মারা গেলেন। দুই অবিবাহিতা বোনের দায়িত্ব নিয়ে জেরবার প্রকাশ। ১৯৫০ সালে আর্ট স্কুলের ড্রপ-আউট একটা ব্লক তৈরির কারখানায় কাজ করতেন। জীবিকার সন্ধানে ওই বছরের শেষে তিনি টেরিটোরিয়াল আর্মিতে সাধারণ সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর অপমানকর চাকরি সহ্য হয় না। চাকরি ছেড়ে দেন। তখন সদ্য স্বাধীন দেশে তাঁর একটাই লক্ষ্য, একটাই বেঁচে থাকা; ছবি আঁকা। অথচ, তখনও তিনি পাননি ছবি আঁকার প্রথাগত শিক্ষা। ছোটবেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে বাবার স্টুডিওতে যেতেন। বাচ্চা ছেলের অদম্য কৌতুহলে জনৈক মডেলের গোপাল নামের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে লুকিয়ে নগ্ন মডেলকে

দেখার আকুতি আর নিজের মাকে নগ্ন দেখে গোপালের কেঁদে ওঠা তাঁকে দিয়েছিল শ্রেণীগত উচ্চস্তরের শ্লাঘা। সেই শ্রেণী থেকে তাঁর পতন ঘটেছে। অথচ তিনি জানেন না ছবি আঁকার কৃত কৌশল। এরই মধ্যে ১৯৫২ সালে ১২৫ টাকার মাহিনার একটা চাকরি পেলেন। সেই চাকরি তাঁকে আর্থিক সুস্থিরতা দিল। কিন্তু ছবি আঁকার কী হবে? মৃণাল ঘোষ এক প্রবন্ধে প্রকাশ কর্মকারের তখনকার জীবনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হল : 'বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদ ভবনে চাকরি করতে যেতেন সকাল ৯টায়। সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ওখানে কাজ। ওখান থেকে যেতেন বাগবাজারে কমলারঞ্জনের স্টুডিওতে।... বিকেল থেকে খানিকটা রাত পর্যন্ত ওখানে কাজ করতেন। তারপর খেতেন পথের ধারে এক ওড়িয়াবাসীর দোকানে। খেয়ে গঙ্গার ধারে ঘুমিয়ে নিতেন কিছুক্ষণ। আধ ঘন্টা এক ঘন্টা, কখনো বা দু-তিন ঘন্টা শুয়ে বেরিয়ে পড়তেন ছবি আঁকতে। সারারাত ছবি এঁকে ভোরে ফিরতেন বাগবাজারে। তারপর স্নান সেরে আবার চাকরিতে যেতেন।'

আর এভাবে রাতচরা নাগরিক যুবকের অভিজ্ঞতায় উঠে এল স্বাধীন দেশের পুলিশের ফুটপাতবাসিনীকে বলাৎকারের ঘটনা। দেখলেন উদ্বাস্তু মানুষের জীবনের সীমাহীন অন্ধকার। বন্ধুর মায়ের কাছে পেলেন যৌন অভিজ্ঞতা। প্রথম প্রেমিকার গর্ভপাত ঘটিয়ে তাকে করে দিলেন উন্মাদিনী। তখন থেকেই তিনি নিজেই নিজের অভিভাবক। আধুনিক মননের ছবি আঁকার দর্শন শিখলেন সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত নীরদ মজুমদারের কাছে।

নিজেকে গড়তে চেয়ে বারবার ভাঙনের মধ্যে দিয়ে তখন তাঁকে যেতে হচ্ছে। জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে শেখাচ্ছে পূর্বজদের নস্যাৎ করতে। স্পষ্ট ঘোষণা করলেন যামিনী রায়ের ছবিতে কোন প্রাণ নেই। রবীন্দ্রনাথের ছবি মোটেও আহামরি নয়। গগনেন্দ্রনাথের ছবি হল মিনিয়েচার কিউবিসম। আর নন্দলাল তাত্ত্বিক শিক্ষক। শিল্পী নন। প্রকাশ কর্মকার তখন আপাদমস্তক এক নাস্তিক মানুষ। চাইছেন ট্র্যাডিশন ভাঙার রাস্তা খুঁজতে। পরবর্তীকালে এ সময়ের তাঁর মানসিক অবস্থাকে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এইভাবে : 'সুতরাং এই নপুংসক দেশে, এই নির্বিজ্ঞান মায়া ও চমৎকার দর্শন সমৃদ্ধ অশিক্ষিত দেশের শিল্পকলা বা চিত্রকলা কী হবে – তার একটা মোটামুটি ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি, অর্থাৎ আমি এখানে এসে কীভাবে কাজ করতে পারি বা কী আমার ধরণ হবে যে ধরণের দ্বারা ছবি এঁকে যাব। এইসব চিন্তাভাবনা করতে গেলে প্রথমেই কঙ্কালটাকে শরীর থেকে ফেলে দিতে হবে। ঠিক যেন থকথকে মাংসের পিণ্ডের দ্বারা মানুষরূপী একটা কেঁচো। হয়তো বা খানিকটা কৃমিকীটের মতন। খানিকটা হয়তো কালীঘাটের পটচিত্রের মতন। মানুষ যেন স্ট্রাকচারহীন।'

১৯৫৯ সালে সদর স্ট্রীটের ফুটপাতের রেলিঙে তিনি তাঁর ছবির প্রদর্শন করলেন। যা ভারতে প্রথম। ততদিনে কৃত্তিবাসীয় কবি-লেখকদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে কখনও খালাসিটোলায়, কখনও বা সোনাগাছি। অর্থাৎ বোহেমিয়ান জীবনে ভেসে গেছেন। এই অভূতপূর্ব প্রদর্শনী থেকে প্রকাশ কর্মকার নিজস্ব এক পরিচিতি লাভ করলেন।

১৯৬০-এর দশক এল ৫৯-এর খাদ্য সংকট নিয়ে। ব্রিটিশ ভারতে বিদেশি শক্তি এদেশের সামাজিক, ধর্মীয় কিংবা অর্থনৈতিক কোনো উন্নয়ন করেনি। বরং এক শ্রেণীর বাবুমশাই তৈরি করে গেছে, যারা তাদের অবর্তমানে দেশটাকে ছিবড়ে করবে। নেহরুর ভারত তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পুঁজিপতিদের সাহায্যের জন্য তৈরি হল বৃহৎ নদীবাঁধ প্রকল্প। সেচ ব্যবস্থার সুফল পেল কেবল জোতদার শ্রেণী। বড়ো বড়ো কলকারখানা তৈরি হল। হল উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষাসদন। ফলে যারা ক্ষমতাবান, তাদের হাতে ক্ষমতার শেষ কড়িটিও পৌঁছে গেল। আর নিরন্ন, অবজ্ঞাত ভারতবাসী আরও নিরন্ন হল। তাদের না জুটল প্রাথমিক শিক্ষা। তারা না পেল তাদের চাষ কিংবা শ্রমের মূল্য। পশ্চিমবঙ্গের বিধান রায় সরকার ব্যর্থ হল খাদ্য সংকটের মোকাবিলায়। গাঁ উজিয়ে চাষের মানুষ পরিবার নিয়ে হাজির হলেন শহরের মধ্যবিত্তের দরজায়। সেখানেও অন্নের হাহাকার। এরই মধ্যে ভারত-চীন যুদ্ধ লাগল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি টুকরো হল। ফ্রান্সে ছাত্র আন্দোলনের ফলে দুনিয়া জুড়ে শ্লোগান উঠল ‘আরও স্বাধীনতা’। আমেরিকা ভিয়েতনাম আক্রমণ করল। অ্যালেন গীনসবার্গ লিখলেন ‘Like a homosexual capitalist afraid of the masses / and that’s my situation, Folks ...’। এই সময় প্রকাশ কর্মকারের ছবি-জীবনে তৈরি হল বিক্ষোভ। ১৯৬০-এর প্রথম প্রদর্শনীর পরে সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারি আর্টিস্ট ছেড়ে দিলেন। ১৯৬৪ সালে যোগ দিলেন ক্যালকাটা পেন্টার্সে। নিজেকে ভেঙেচুরে তখন চলছে তাঁর অবিরাম ছবি আঁকা।

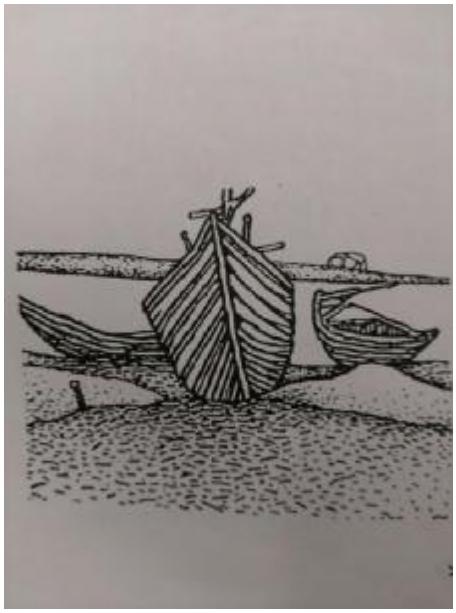

কিন্তু কী ছিল তখনকার তাঁর ছবির বিষয়? কীভাবে নিজেকে ভেঙে নিচ্ছিলেন প্রকাশ কর্মকার?

সেদিনের সংকট কেবল প্রকাশের একা ছিল তা নয়। তাঁর সতীর্থ যোগেন চৌধুরী, অসীম বিশ্বাস কিংবা শ্যামল দত্তরায়ও আক্রান্ত ছিলেন একই ভাবনায়। তবে তাঁদের সঙ্গে প্রকাশের মূলগত পার্থক্য ছিল। এরা সকলেই আর্ট স্কুলের দলছুট কিংবা দুষ্টু ছাত্র ছিলেন। ফলে আর্থিক বিপর্যয় ছিল তাঁদের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু প্রকাশের মতো তাঁদের অবস্থাগত পরিবর্তন ঘটেনি। তাঁরা তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য ব্যবস্থাকে ততটা দায়ী করেননি,

যতটা করেছেন প্রকাশ। জাতিদাঙ্গায় তাঁর পিতৃদেবের সৃষ্টি নষ্ট হয়েছে। দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু না হয়েও তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। আলোকিত জীবনের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে ডুবে গেছেন নিকষ অন্ধকারে। ফলে তাঁর মধ্যে বিক্ষোভ খুবই স্বাভাবিক। তাঁর এই বিক্ষোভ অনেকটা নবারুণ ভট্টাচার্যের মতো। মধ্যবিত্ত শ্রেণী চেতনার মধ্যে থেকেও প্রলেতেরিয়ত জীবনের প্রতি ঝোঁক। ফলে প্রকাশের ছবিতে এল অ্যানাটমিহীন মানুষ শরীর। বিসদৃশ্য যোনি মুখ। অস্বাভাবিক নাভিকুণ্ড। অবিন্যস্ত স্তনমণ্ডলি। কোন একটা মেয়ে শরীর। যে শরীর শুধু পুরুষের দৃষ্টিতে সৃষ্ট। যে শরীরে 'শরীর শরীর, তোমার মন নাই কুসুম!'

ছবি আঁকার পাশাপাশি সেই সময় প্রকাশ কর্মকার কবিতাও লিখেছেন। সে-সব কবিতা খুব উৎকৃষ্ট কিছু নয়, তবে তাঁর সময় তাঁর মতো করে আর কেউ সাহিত্যের ভাষাকে মান্যতা দেননি। ফলে এই সময়ে তিনি যে ছবি এঁকেছেন তা নারী শরীর, ঘোড়া কিংবা পুরুষ-নারীর যুগলবন্দী, তা সবই আমাদের লিবিডোকে আক্রমণ করে। প্রকাশ কর্মকার সর্ব অর্থে ছিলেন নাস্তিক মানুষ। ফলে সামাজিক দায়বদ্ধতা তিনি বরাবর অস্বীকার করেছেন। সারাজীবনে তিনি বহু নারীশরীর ঘেঁটেছেন। শরীর ছেনে বুঝে নিতে চেয়েছেন হৃদয়ের কথা। ফলে তাঁর ছবির প্রেক্ষাপট জুড়ে কেবল বিসদৃশ্য, থকথকে কাদার মতো নারী শরীর। হাড়গোড়হীন। ফলে দ্বি-পদীদের মতো এই শরীরগুলোর মধ্যে নেই সেন্টার অফ গ্রাভিটি। উলম্ব বরাবর তারা দণ্ডায়মান নয়। বরং জেলির মতো থকথকে। এই শরীর গঠনেই তাঁর যাবতীয় বিক্ষোভ, বিদ্রোহ জমে থাকে। তিনি আরও ডিসটর্টেড ফিগার এঁকে যান।

এভাবেই খুব দ্রুত নিজের স্বকীয়তার কারণে প্রকাশ কর্মকার তাঁর সমসাময়িক চিত্রীদের থেকে যোজনদূর। তাঁর ছবিতে স্পষ্ট করে দিতে চাইছিলেন ফিগার। ফিগার সর্বস্বতা। একটা রেখার পাশে আর একটা রেখা। কম্পিত। ভীরু। এঁকে দেন প্রকাশ কর্মকার।

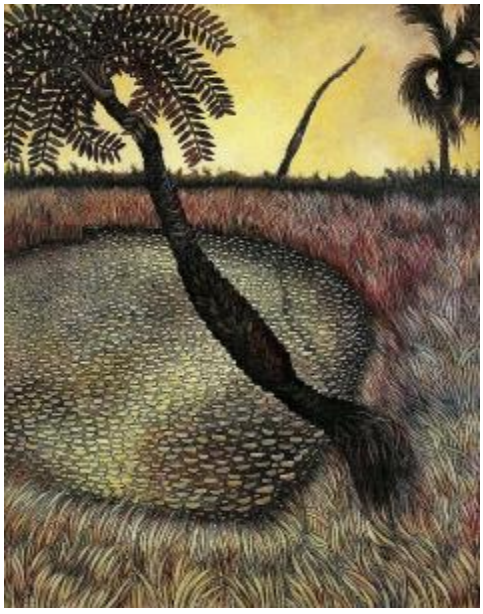

১৯৬৯ সালে ফরাসি সরকারের বৃত্তি নিয়ে গেলেন পশ্চিম ইউরোপে। দেশে ফিরে চাকরির সূত্রে বদলি হলেন এলাহাবাদের কাছে নৈনিতে। সেখানেই কাটল তাঁর অগ্নিগর্ভ ১৯৭০-এর দশক। ১৯৮৮ সালে কলকাতায় ফিরে রাজচন্দ্রপুরে বাড়ি করে বসবাস শুরু করলেন। ততদিনে প্রকাশ কর্মকার এক ফেনোমেনন। এই পর্বে *প্রতিক্ষণ* সাময়িকপত্রের বিভিন্ন সংখ্যায় অলংকরণের কাজ শুরু হল। বিশেষত দেবেশ রায়ের *বিপ্লবের অসময় এরকম ঘটে থাকে, ধর্ষণের পরদিন এরকম ঘটে থাকে* উপন্যাসগুলোয় তাঁর অলংকরণে সেই আদি ও অকৃত্রিম প্রকাশ কর্মকারকেই আমরা পাই। যদিও এরপরে খুব দ্রুত বদলাতে

থাকে তাঁর ছবি আঁকার বিষয়। তিনি তখন অনেকটাই নম্র। সহনশীল। তাঁর সহযোগীদের মতো এখন তিনি আর ততটা বিক্ষুব্ধ নন। বরং ল্যাণ্ডস্কেপ রচনায় নতুন এক শৈলী তৈরিতে মশগুল।

কলকাতায় ফিরে জীবন সায়াহ্নে তিনি যে মগ্নতায় প্রাকৃতিক জীবন এঁকে গেছেন, তার তুল্য সমসাময়িক শিল্পভাবনায় নেই। থাকার কথাও নয়। যদিও পথ পাল্টালেও তিনি কখনও স্বধর্মে বিচ্যুত হননি।